গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭০ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ২০ - ২৬ এপ্রিল ২০১৮ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

সিরিয়ার উপর মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলার তীব্র নিন্দা

সিরিয়ার উপর সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা, ফ্রান্স, ব্রিটেনের ভয়ঙ্কর ক্ষেপণাস্ত্র হামলার নিন্দা করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৪ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন, সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন, রীতি-নীতি এবং প্রথাকে সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা-ব্রিটেন-ফ্রান্স একযোগে ১৪ এপ্রিল ভোরে সিরিয়ার উপর কমপক্ষে ১০০টি ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে বর্বর হামলা চালিয়েছে। বিদ্রোহীদের উপর আসাদ সরকারের রাসায়নিক হামলার মিথ্যা অজুহাতে এই ক্ষেপণাস্ত্র হানা চালানো হয়েছে। যদিও এই রাসায়নিক হামলার অভিযোগের কোনও প্রমাণ নেই এবং অভিযোগটি পুরোপুরি ভিত্তিহীন।

বিশ্বের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শান্তিকামী মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, এই জঘন্য হামলার নিন্দায় সোচ্চার হোন। এই বর্বর হামলা অবিলম্বে বন্ধ করার দাবিতে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলুন।

(রাজ্যে রাজ্যে বিক্ষোভের ছবি পাঁচের পাতায়)

এ কোন খাদের কিনারায় দেশকে নিয়ে চলেছে বিজেপি!

একটি শিশুর ওপর এমন নির্যাতন চালাতে পারে কোনও মানুষ? পাশবিক নির্যাতনের পর এমন করে তাকে হত্যা করতে পারে কোনও মানুষ? কোনও মানুষ পারে সেই শিশুর জাত কী, ধর্ম কী প্রশ্ন তুলে তার হত্যাকে সমর্থন করতে? এই প্রশ্নটাই ভাবাচ্ছে তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করা ভারতবাসীকে। কোন অন্ধকারের পথে চলতে চলতে এমন সর্বগ্রাসী খাদের কিনারায় দাঁড়িয়েছে দেশ!

জম্মুর আসিফা, গুজরাতের সুরাতে পাশবিক আক্রমণের শিকার নাম না জানা কিশোরীর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহ, উত্তরপ্রদেশের বিজেপি বিধায়কের শিকার উন্নাওয়ের তরুণী, এমন কত— আরও কত শিশু কন্যা-তরুণী-নারী পাশবিক লালসায় দগ্ধ হয়ে গেলে তবে 'বেটি বাঁচাতে' নামবেন প্রধানমন্ত্রী?

জম্মুর শিশুকন্যা আসিফাকে মন্দিরে আটকে রেখে বেশ কয়েকদিন ধরে ধর্ষণ করা হল। তারপর ঠাণ্ডা মাথায় খুন করল ওই মানুষদেহধারী পশুর দল। তাদের দোসর হয়ে দাঁড়াল পুলিশের একাধিক কর্মচারী। যখন এই দুষ্কর্ম চাপা থাকল না, তখন ধর্ষক-খুনিদের হয়ে রাস্তায় নামল হিন্দু ধর্মের স্বঘোষিত অভিভাবক আরএসএস-বিজেপির অন্যতম শাখা 'হিন্দু একতা মঞ্চ'। নরপশুদের মুক্তি চেয়ে মিছিলে সামিল হলেন জম্মুর দুই বিজেপি মন্ত্রী চন্দ্রপ্রকাশ গঙ্গা এবং লাল সিংহ। এক বিজেপি নেতা এতে পাকিস্তানের চক্রান্ত খুঁজে পেলেন! আর এক বিজেপি নেতা ফেসবুকে পোস্ট করে দিলেন, যা হয়েছে তা ভালই হয়েছে। কে বলতে পারে এই মেয়েই একদিন পুলিশের দিকে পাথর ছুঁড়ত না! প্রধানমন্ত্রী, অনেক টালবাহানার

চারের পাতায় দেখুন

উন্নাও এবং কাঠুয়ায় দুই নাবালিকার উপর নৃশংস নির্যাতন ও খুনের প্রতিবাদে কলকাতায় রাজভবনের সামনে ডিএসও, ডিওয়াইও এবং এমএসএস-এর বিক্ষোভ। ১৩ এপ্রিল

নির্বাচনের রায় এখন দুষ্কৃতীদের হাতে

সাংবাদিক সম্মেলনে শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চ

১১ এপ্রিল কলকাতা প্রেস ক্লাবে শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি বিভাস চক্রবর্তী এবং সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী ও সান্টু গুপ্ত এক লিখিত বিবৃতিতে রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাকপর্বে মনোনয়পত্র জমা দেওয়া নিয়ে হিংসার যে ঘটনা ঘটছে তা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে গৌরবজনক নয়। কয়েকটি মাত্র ব্যতিক্রম বাদ দিলে এই রাজ্যের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটেছে তা আমাদের দেশবাসী এমনকী বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে আমাদের হেয় করে তুলেছে। নির্বাচনের উদ্যোগপর্ব থেকে এ ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে দুষ্কৃতীদের হাতে চলে গিয়েছে। এই দুষ্কৃতীদের রাজনীতির অ-আ-ক-খ জ্ঞান আছে কিনা জানা নেই, কিন্তু তারা যে অনেকাংশেই রাজ্যে বিশালতম নির্বাচনের ভাগ্য নির্ধারণ করতে চলেছে সেটা স্পষ্ট। গণতন্ত্রের টুঁটি চেপে ধরে যারা গণতন্ত্রের সব থেকে বড় উৎসবকে একটা দুঃশীল কার্যক্রমে পর্যবসিত করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার সময় এসেছে। আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি কোনও কোনও নেতা বিরোধীশূন্য রাজ্য এবং বিরোধীশূন্য দেশ গড়ার কথা বলছেন। এটি গণতান্ত্রিক ভাবনার বিরোধী ও স্বৈরাচারী ভাবনার জন্ম দেয়। বর্তমান পঞ্চায়েত নির্বাচনের উদ্যোগপর্বে দুষ্কৃতীদের কাজ কতটা রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট, প্রশাসনের কাছে কতটা ছাড়প্রাপ্ত সেটা মানুষ নিজ অভিজ্ঞতাবলে অনুভব করবে। মনোনয়নপর্বের এই ভয়ঙ্কর অবস্থা প্রকৃত নির্বাচনের সময় আরও ভয়ঙ্করতম হবে বলে আমাদের আশঙ্কা হয়। জনসাধারণের সজাগ দৃষ্টির সাথে সরকারি প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশন যদি যথাযথ ভূমিকা পালন করে তাহলে এই অবস্থা পরিবর্তন করা সম্ভব।

১১ এপ্রিল সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন বিভাস চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন প্রতুল মুখোপাধ্যায়, বিমল চ্যাটার্জী, দিলীপ চক্রবর্তী, মীরাতুন নাহার, সুজাত ভদ্র, মালবিকা চট্টোপাধ্যায়, ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, তরুণ মণ্ডল, পল্লব কীর্তনিয়া প্রমুখ।

আমরা আর একটি দাবি উত্থাপন করব। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় রাজ্য নির্বাচন কমিশন, রাজ্য সরকার এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রচুর বাক-বিতন্ডা লক্ষ করা গিয়েছিল। বিষয়টা শেষ অবধি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। সুপ্রিম কোর্ট কমিশনের পক্ষে রায় দিয়ে নির্বাচনের দিন বা দফা নির্ধারণ করেন, এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের আদেশ দেন। কিন্তু বিবাদের মূল কারণ যা ছিল, অর্থাৎ ২০০৩ সালের পঞ্চায়েত আইনের বিশেষ কয়েকটি

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিনামূল্যের ১৩২০টি জীবনদায়ী ওষুধ হাসপাতালে সরবরাহ বন্ধ করে দিল তৃণমূল সরকার

১ এপ্রিল রাজ্যের জনগণকে 'এপ্রিল ফুল' করল তৃণমূল সরকার। বোকা বানাল পশ্চিমবঙ্গ বাসীকে। বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়ার সরকারি প্রতিশ্রুতি কার্যত প্রত্যাহার করে নিল।

ওই দিন থেকে রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে দেওয়া বিনামূল্যে ওষুধের সংখ্যা বিপুল পরিমাণে কমিয়ে দেওয়া হল। জেলা হাসপাতালগুলিতে ওষুধের সংখ্যা ৭৫ শতাংশ কমানো হল। মহকুমা ও ব্লক হাসপাতালগুলিতে বিনামূল্যে ওষুধের সংখ্যা আরও কমানো হয়েছে। বাস্তবে বিনামূল্যে ওষুধ পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়েই সংশয় দেখা দিয়েছে। তাহলে সরকারের এত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ফ্রি-তে ওষুধ দেওয়ার ঘোষণা কেন?

বন্ধ করা ওষুধগুলির বেশিরভাগই জীবনদায়ী। কেমোথেরাপি থেকে শুরু করে স্ট্রোকের পরে রোগীকে বাঁচানোর জরুরি ওষুধ সমস্তই রয়েছে এই তালিকায়। এ ধরনের ১৬০০টি জীবনদায়ী ওষুধ কমিয়ে করা হয়েছে ৪৮০। শুধু তাই নয়, এই ৪৮০টি ওষুধের মধ্যে কোন হাসপাতালে কোন ওষুধ থাকবে, তা ঠিক করবে জেলা এবং মেডিকেল কলেজ স্তরের হাসপাতালই। অর্থাৎ ৪৮০টি ওষুধও সব হাসপাতালে পাওয়া যাবে না।

বেশিরভাগ মানুষের জন্য নেওয়া বিনামূল্যে ওষুধ প্রকল্প মর্জিমাফিক সরকার বন্ধ করতে পারে কি? এক স্বাস্থ্য অধিকর্তার সাফাই, 'দামি ওষুধ বাদ দিয়ে পাঁচজন সাধারণ রোগীর মূলত যে সব ওষুধের প্রয়োজন হয়, তাই রাখা হয়েছে'। চিকিৎসকদের প্রশ্ন, তাহলে শিশুদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আইসোলাইটের মতো সলিউশন বাদ কেন? তার উত্তরে স্বাস্থ্য অধিকর্তা জানান, সলিউশন তৈরি করে নিলেই হল। প্রশ্ন উঠেছে, নার্স বা ডাক্তারদের পক্ষে কি সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামোয় শিশুদের সংক্রমণ বা সেপসিস নিয়ন্ত্রণ করতে তড়িঘড়ি সলিউশন বানানো সম্ভব? এর উত্তর অবশ্য স্বাস্থ্যকর্তারা দেননি।

জেলা হাসপাতালগুলিতে ওষুধের সংখ্যা ৭৫ শতাংশ কমানো হল। মহকুমা ও ব্লক হাসপাতালগুলিতে বিনামূল্যে ওষুধের সংখ্যা আরও কমানো হয়েছে। বাস্তবে বিনামূল্যে ওষুধ পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়েই সংশয় দেখা দিয়েছে। তাহলে এত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ফ্রি-তে ওষুধ দেওয়ার ঘোষণা কেন সরকারের?

সারা দেশের মতো এ রাজ্যেও গরিব মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, বাড়ছে কাজ হারানো মানুষের সংখ্যা। ছাঁটাই হচ্ছে অসংখ্য মানুষ। দু'বেলা খাবার জোটানোই কঠিন হয়ে পড়ছে বহু মানুষের। সেখানে হাসপাতালের ওষুধ বন্ধ হলে, সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবার আর কী অবশিষ্ট রইল? সরকারি হাসপাতালে পরিকাঠামোগত নানা অসুবিধা সত্ত্বেও হতভাগ্য এই মানুষগুলিকে সেখানেই ছুটতে হয়। ভোর থেকে উঠে প্রত্যন্ত এলাকা থেকে বাসে-ট্রেনে-ভুটভুটিতে চেপে জেলা কিংবা ব্লক হাসপাতালে রোগী নিয়ে পৌঁছনোর মরীয়া চেষ্টা করে তারা। হাতে পয়সা নেই, সরকারি হাসপাতালে পৌঁছালে ডাক্তারবাবু যা হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করবে, নিখরচায় কিছু ওষুধ পাওয়া যাবে, অন্তত প্রিয়জনের প্রাণ বাঁচানো যাবে, এমনই আশা করে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন রোগীর আত্মীয়-পরিজনরা। তাদের আশা নিরাশায় পরিণত হচ্ছে সরকারের এই অমানবিক সিদ্ধান্তে।

বেসরকারি হাসপাতালে সরকারের যেটুকু রাশ ছিল, তাও উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। রোগীর পরিজনদের নিংড়ে নেওয়ার ছাড়পত্র জোগাড় করেছে বেসরকারি হাসপাতালগুলি। কোনও কোনও কর্পোরেট হাসপাতালে চিকিৎসক রোগীদের কত বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কত অপারেশন করাতে পারছে, তার ভিত্তিতে মাইনে চালু করার নীতিও সরকার মেনে নিয়েছে। চিকিৎসকের মতো একটা মহৎ পেশাকে দালালের স্তরে নামিয়ে আনার বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টার বিরোধিতা না করে কার্যত তাতে রাবার স্ট্যাম্প লাগিয়েছে সরকার।

এই নীতির ফল হিসাবেই আমরি কিংবা অ্যাপোলোর মতো কর্পোরেট হাসপাতালে মর্মান্তিক শিশুমৃত্যুর ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। সরকার বলেছিল, বেসরকারি হাসপাতালগুলির ফি স্ট্রাকচার এমন থাকবে, যাতে যারা বেসরকারি হাসপাতালে যেতে বাধ্য হবে, তাদের পরিবার নিয়ে পথে বসতে না হয়। কিন্তু তা কথাতেই থেকে গেছে। একদিকে সরকারি হাসপাতালে নানা তুঘলকি সিদ্ধান্ত, অন্যদিকে বেসরকারি হাসপাতালের রক্তচোষা নীতি রোগীর পরিজনদের অসহায় অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

সামাজিক আন্দোলনই একমাত্র পারে উগ্র হিন্দুত্বকে রুখতে

মানুষের শুভবুদ্ধিই যেভাবে একদিন বারাসাত-বসিরহাটের মানুষকে নানা প্ররোচনার জাল থেকে নিজেদের মুক্ত করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সাহায্য করেছিল, আসানসোল-রানিগঞ্জ সেভাবেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরছে। রামভক্তির মহড়া দিতে ভোটকারবারিদের লড়ালড়ি এবং পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার বলি ছয় ছয়টি তাজা প্রাণ অকালে ঝরে যাওয়ার গভীর ব্যথার মুহূর্তেও তাদের বিবেককে নাড়া দিয়ে গিয়েছে সদ্য পুত্র হারা ইমাম রশিদি এবং তাঁর মতো রক্তাক্ত মানুষদের বুকফাটা সেই আর্তি—অনেক হয়েছে, আর নয়। এই হানাহানি বন্ধ কর।

সংবাদে প্রকাশ, নবান্নের একাংশের অভিমত— রামনবমীর দিন পুলিশের ভূমিকা সন্দেহের ঊর্ধ্বে ছিল না। রামনবমীর দিন যেভাবে রাজ্যের একাধিক স্থানে রক্ত ঝরল, লুটপাট হল, আগুন ধরানো হল, ছ'জন নিরাপরাধ মানুষ প্রাণ হারালেন, তাতে এ প্রশ্ন উঠতে বাধ্য— সেদিন পুলিশ-প্রশাসনের বাস্তবে কোনও ভূমিকা আদৌ ছিল কি? অথচ সকলেই লক্ষ করেছিলেন, ওইদিন অস্ত্র হাতে মিছিল করা না-করা নিয়ে উত্তেজনার পারদ ক্রমেই চড়ছিল।

কিছু কিছু এলাকায় মানুষের মধ্যে উদ্বেগ ও আশঙ্কাও তীব্র আকার নিয়েছিল। এ বিষয়গুলি প্রশাসনের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়। তা হলে সব জেনেও তারা পরিস্থিতি মোকাবিলায় যথাযথ ব্যবস্থা নেননি কেন? না কি রামভক্তির প্রতিযোগিতায় অন্যতম পক্ষ তৃণমূলও— এ কারণেই গোড়ায় তারা কিছুটা গা-ছাড়া অবস্থান নিয়েছিল? অন্যদিকে রাজ্যপালের অতি-তৎপরতাও ছিল লক্ষ করার মতো। ঘটনার একদিন বাদেই কি কারণে আসানসোলে যেতে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন? আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোই কি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, না কি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধির ভূমিকা নিয়ে ঘোলা জলে ফয়দা তুলতেই তিনি বেশি আগ্রহী ছিলেন?

আশার কথা, উত্তেজনার পারদ যত কমছে, রামভক্তির প্রতিযোগিতার পেছনকার উদ্দেশ্যও সাধারণ মানুষের কাছে ততই পরিষ্কার হয়ে আসছে। বিজেপি-আরএসএসের রামভক্তি ও অস্ত্র আস্ফালনের সঙ্গে যে ধর্মের কোনও সম্বন্ধ নেই, রয়েছে নির্ভেজাল ভোটের অঙ্ক, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের কাছে তা বিশেষ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। কারণ বার বারই তাঁরা দেখছেন, হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক নিশ্চিত করতে কোনও অপকর্ম করতেই এদের বাধে না। ধর্মের নামে উন্মাদনা সৃষ্টি করতে, দাঙ্গা বাধিয়ে অসংখ্য মানুষের জীবন কেড়ে নিতে এদের হাত কাঁপে না। দাভোলকর, পানেসর, কালবুর্গি, গৌরী লঙ্কেশের মতো মুক্ত মনের মানুষেরা এদের শিকার। কারণ সত্যকে এরা ভয় পায়। এদের হাতিয়ার অন্ধতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি। অসহিষ্ণুতা এদের মূলধন— যা ভোটের মুখে চূড়ান্ত রূপ নেয়। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ, গুজরাটের ভোটেও মানুষ তা দেখেছেন। এর মধ্যে ধর্ম কোথায়? আজ এদের লক্ষ্য পশ্চিমবাংলা। তাই বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের বাংলাকে এরা সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে কলুষিত করতে চাইছে।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মানুষের ধর্ম বিশ্বাস এবং ধর্মের নামে ভোটব্যাঙ্ক তৈরির ঘৃণ্য রাজনীতি এক নয়। কোনও ধর্মবিশ্বাসী মানুষই অপর ধর্মের মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত করতে পারে না। হিন্দু ধর্মের নানা প্রবক্তার মুখে আমরা এ কথাই শুনে এসেছি। রামকৃষ্ণ বলেছেন, যত মত তত পথ। বিবেকানন্দ বলেছেন, একই সঙ্গে আমার স্ত্রী বৌদ্ধ, আমার পুত্র হিন্দু এবং আমি মুসলিম ধর্মে বিশ্বাস করতে পারি। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। চৈতন্যদেব তাঁর যুগে মানুষে মানুষে বিভেদ-বিদ্বেষের প্রাচীরকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বিজেপি-আরএসএসের হিন্দুত্বের সাথে চৈতন্যদেব, বিবেকানন্দের হিন্দুত্বের কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যায় কি?

এখানে একটি বিষয় বুঝতে হবে। বর্তমানে দেশের আসল শাসক যারা সেই শোষক বুর্জোয়া শ্রেণি এই বিভেদ-বিদ্বেষের রাজনীতির মধ্যেই খুঁজে পেয়েছে তাদের বাঁচার শেষ আশ্রয়। একদিন যে বুর্জোয়া শ্রেণি নবজাগরণের চিন্তা নিয়ে এসেছিল, পুরনো সমাজের কূপমণ্ডুকতাকে ভেঙে গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনায় নতুন সমাজ গড়তে চেয়েছিল, ইতিহাসের গতিপথে ক্ষয়িষ্ণু মরণোন্মুখ স্তরে এসে সেই বুর্জোয়া শ্রেণিই আজ সমাজে বিভেদের সমস্ত উপাদানগুলিকে জিইয়ে তুলতে চাইছে, তাতে ইন্ধন জোগাচ্ছে। এইভাবে তারা চাইছে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত খেটে-খাওয়া মানুষের ঐক্যকে ভেঙে দিতে, যাতে বর্তমান শোষণব্যবস্থার বিরুদ্ধে তারা এক হয়ে রুখে দাঁড়াতে না পারে।

একই সঙ্গে এ কথাও বুঝতে হবে, বিজেপি-আর এস এসের উগ্র হিন্দুত্বকে ঠেকাতে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে রাস্তায় নেমে রামভক্তির প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং হিন্দু ভাবাবেগের চ্যাম্পিয়ান সাজতে চেয়েছে, সাম্প্রদায়িকতাকে ঠেকানোর এটা কোনও কার্যকরী পথই নয়। বরং এর দ্বারা সাম্প্রদায়িকতাই আরও পুষ্ট হবে।

অবশ্য বর্তমান ব্যবস্থায় নানা রঙের শাসক বা শাসক-পদাকাঙ্ক্ষী বুর্জোয়া শ্রেণি নানা দলগুলিকে এই ভূমিকাতেই আমরা দেখতে অভ্যস্ত। ভোটব্যাঙ্ক তৈরি বা রক্ষার স্বার্থে এরা কখনও হিন্দুত্বের চ্যাম্পিয়ান, আবার কখনও সংখ্যালঘু বা দলিত স্বার্থের চ্যাম্পিয়ান সাজে। এই কারণেই তৃণমূল রাম নবমীর পর হনুমান জয়ন্তীকেও হাতছাড়া করেনি। একই কারণে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীও গুজরাটে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে রীতিমতো টক্কর লড়ে মন্দিরে মন্দিরে হাজিরা দিয়েছেন। এই ভোটরাজনীতি সাম্প্রদায়িকতার বিষ সমাজজীবন থেকে নির্মূল করতে পারে না। বরং তাকে বাড়াতেই সাহায্য করে। এ কাজ একমাত্র তারাই করতে পারে যারা ধর্ম-বর্ণ, জাত-পাত, ভাষা-আঞ্চলিকতা নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে তাদের সামাজিক অবস্থান চিনতে শেখায়। খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনের যে মূল সমস্যা— বেকারি-মূল্যবৃদ্ধি-অশিক্ষা-স্বাস্থ্যহীনতা-নিরাপত্তাহীনতা— সব কিছুর মূলে যে শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, তার বিরুদ্ধে এক হয়ে লড়তে শেখায়। এ কাজ যারা প্রচলিত শোষণব্যবস্থার অবসান চায়, তারাই একমাত্র করতে পারে।

উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা আজও যে বাংলায় তাদের শক্ত ভিত দাঁড় করাতে পারেনি, আজও যে মানুষের শুভবুদ্ধি কিছুটা দেরিতে হলেও জাগ্রত হয়ে এদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেয়, যার প্রমাণ আমরা আসানসোল-রানিগঞ্জে পেলাম, তার মূলে রয়েছে বাংলার সেই সংগ্রামী ঐতিহ্য, একদিন যার শুরু হয়েছিল রামমোহন-বিদ্যাসাগরের হাত ধরে। পরবর্তীকালে এই ধারায়, স্বাধীনতার বেদিমূলে নেতাজি-ক্ষুদিরাম-বিনয়-বাদল-দীনেশ-বাঘা যতীন-প্রীতিলতা প্রমুখ অগণিত বীর বিপ্লবীদের আত্মদান এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বামপন্থীদের নেতৃত্বে বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এই ঐতিহ্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছিল। এই ঐতিহ্যই বাংলার বুকে সাম্প্রদায়িকতাকে জায়গা করতে দেয়নি। ৩৪ বছরের সিপিএম রাজত্ব এই ঐতিহ্যের ভিতকে অনেকটাই ধসিয়ে দিয়েছে যার সুযোগ নিচ্ছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। এর রেশ যতটুকু এখনও টিকে রয়েছে, তাকে আবারও শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে পারে সামাজিক চেতনা ও উন্নত নীতি-নৈতিকতার আধারে গড়ে ওঠা শক্তিশালী সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এই উপলব্ধি এবং তার বাস্তবায়নের পথেই একমাত্র সম্ভব সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিহত করা।

সমষ্টিগতভাবে কাজ করা শিখতে হবে বিপ্লবীদের

শিবদাস ঘোষ

২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ৭১তম প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রাক্কালে দলের প্রতিষ্ঠাতা মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ১৯৬৯ সালের ৩০ জুলাই প্রদত্ত অমূল্য ভাষণের একটি অংশ দেওয়া হল।

ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় কাজ বড় কঠিন। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে ব্যক্তিসত্তাটাকে আমরা ফাইট করতে চাই, সেই ব্যক্তিসত্তাটির কারণেই দেখা যায় একজন ব্যক্তি যে খানিকটা ভাসভাসাভাবে হলেও বিপ্লব বোঝে এবং অনেক সময়ে লড়তে চায়, কিন্তু লড়তে চায় সে নিজের নিয়মে। একদিকে সে লড়তেও চায় বিপ্লবের জন্য, আর একদিকে সে তার স্বাধীন, স্বেচ্ছাচারী ঝোঁকটিকেও বাদ দিতে পারে না। অথচ সে জানে না এই লড়াইয়ের সত্যিকারের প্রয়োজনবোধের উপলব্ধির সঙ্গে আরেকটি উপলব্ধিও জড়িয়ে আছে— সেটি হচ্ছে স্বাধীন স্বেচ্ছাচারিতাকেও বর্জন করতে হবে। স্বাধীন স্বেচ্ছাচারিতার লড়াইটা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে কখনোই ঈপ্সিত ফল এনে দিতে পারে না। কারণ তা সমষ্টির পরিকল্পনাধীন নয়। তাই মার্কসবাদী বিপ্লবীদের সংগ্রামের অ্যাপ্রোচ বা দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে 'টু স্ট্রাগল বোথ ইনডিভিজুয়ালি অ্যান্ড কালেকটিভলি' (ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে সংগ্রাম করা)। কারণ একা লড়ে কেউ বিপ্লব করতে পারবে না। তাই কালেকটিভলি কী করে লড়তে হয়, বিপ্লবীদের তা জানতে হবে, শিখতে হবে। একজনকে একা একটা জায়গায় সংগঠনের কাজ করতে দিলে যদি তার লড়াই করার একটা আকাঙ্ক্ষা এবং 'স্যাক্রিফাইস' (ত্যাগ স্বীকার) করবার একটু প্রেরণা থাকে তাহলেই দেখা যায় সাধারণ মানুষগুলিকে নিয়ে নিজের নেতৃত্বে সে খুব ভাল কাজ করে। কারণ তার নেতৃত্ব সেখানে 'আনডিসপিউটেড' (অবিসংবাদিত), তার ব্যক্তিসত্তায় সেখানে বিশেষ ঘা লাগে না, তার ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে কারোর টক্কর লাগে না, সে 'হিউমিলিয়েটেড' (অপমানিত) ফিল করে না, তার ইগোতে কোথাও আঘাত লাগে না। কিন্তু আর পাঁচটা কমরেড যারা 'প্যারালাল পার্সোনালিটি' (সমান্তরাল ব্যক্তিত্ব) তাদের সঙ্গে একটা পরিকল্পনায় মিলে একত্রে কাজ করতে গেলেই দেখা যায় পরস্পর ব্যক্তিসত্তায় টক্কর লাগছে— আর তেমন কাজ হচ্ছে না, নানা গণ্ডগোল হচ্ছে। ফলে সকলে মিলে একত্রে পরিকল্পনা নিজের মতো হয় ভাল, যদি অপরের মত অনুযায়ীও পরিকল্পনাটি হয় সেই পরিকল্পনায় স্বেচ্ছায় এবং খুশিমনে কী করে কাজ করতে হয় সেটি শিখতে হয়। এবং সেটি শিখতে গেলে নিজের স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী মনোভাব বিসর্জন দিতে হয়— না পারলে সেটি শেখা যায় না। এই স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী মনোভাব বিসর্জন দিতে পারাটা শেখা যাবে কী করে? শিখতে গেলে একত্রে কাজ করতে করতে কালেকটিভকে মেনে কাজ করার অভ্যাসটি 'ডেভেলাপ' করাতে হবে। ...

তা হলে মূল কথা হচ্ছে, প্রত্যেককে কালেকটিভের মধ্যে থেকে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। রুটিন ওয়ার্ক— যা বিপ্লবী সংগ্রামের একটা অপরিহার্য অঙ্গ তা বিপ্লবী কর্মীদের এই কালেকটিভের মধ্যে থেকে কাজ করবার অভ্যাস শেখায়, ধৈর্য শেখায়। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তিসত্তা, যে অহম প্রতিনিয়ত তাদের 'ডিসিভ' করে (ঠকায়), ভুলপথের নির্দেশ দেয় তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের সাহায্য করে। প্রত্যেকের মধ্যে তার যে নিজস্ব বুদ্ধি-বিচার তা তাকে একটা জিনিস করতে বলে, অন্য দিকে তার ব্যক্তিসত্তা তাকে তা করতে আটকায়, তাকে অন্য দিকে নিতে চায়। এই হচ্ছে প্রত্যেকের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এই যে প্রত্যেকের মধ্যে দু'টি জিনিসের লড়াই— এটাও আজকের সমাজের বুর্জোয়া এবং শ্রমিকের লড়াইয়ের প্রতিফলন। এই অবস্থায় হয় নিজের মতটাকে কালেকটিভের মতে পরিণত করতে হবে, না হয় কালেকটিভের মতটা নিজের মতের বিরুদ্ধে গেলেও সেই মতটাকেই খুশি মনে মেনে নিয়ে চলতে হবে। এ মানসিকতা যদি না থাকে তাহলে একত্রে চলতে চলতেই নিজের মনের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হবে, নিজের মধ্যে যে বুর্জোয়া সত্তা যেটা ব্যক্তিসত্তার রূপে, 'আলট্রা' (উগ্র) স্বাধীনতার রূপে, স্বাধীনচেতা মনোভাবের রূপে আত্মপ্রকাশ করছে তাকেই একজন লালনপালন করবে। শুধু তত্ত্ব করে মনে মনে ভেবে একজনের মধ্যে যে কুসংস্কার, ব্যক্তিসত্তা, ইনডিভিজুয়ালিটি বা অহম আছে তা দূর করা যায় না। মনে রাখতে হবে, প্রত্যেকের মধ্যে যে চেতনসত্ত্বাটি পারিপার্শ্বিকের সাথে সংঘাতের মধ্য থেকে গড়ে উঠেছে, আবার বিরাজও করছে সেই সংঘাতের মধ্যে— সেই সংঘাতের স্বরূপ নির্ধারণ করে যে সঠিক পথটি পাওয়া গেল সেই পথে যদি চেতনসত্ত্বাটি নিজের কর্মকে নিযুক্ত করতে পারে তবে সে যেমন বস্তুকেও প্রভাবিত করে, নিজেকেও উন্নততর করে। আর তা না হলে সে অধঃপতিত হয়। ...

যে কোনো ভাবনাধারণা— অর্থাৎ যে কোনও চিন্তা, ভাব, ধারণা, কল্পনা— সমস্ত কিছুই মানুষের মনে গড়ে উঠছে বাস্তবের সঙ্গে সংঘাতের

প্রতিফলনে। মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে বিশ্লেষণ করবার, চিন্তা করবার যে ক্ষমতা রয়েছে— যে প্রক্রিয়াটি জন্তু-জানোয়ারের মস্তিষ্কের গঠনের মধ্যে নেই, শুধু মানুষের মস্তিষ্কের গঠনে আছে, সেই প্রক্রিয়াটি থাকার ফলে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষের মনন জগৎ গড়ে উঠেছে। বস্তুজগতের সঙ্গে জন্তু-জানোয়ারদেরও সংঘাত হচ্ছে, কিন্তু তাদের মস্তিষ্কের গঠনে এই প্রক্রিয়াটি না থাকার ফলে তারা 'সাবজেক্টটু ন্যাচারাল ল' অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূতই থেকে গেছে। তাদের সমস্ত কার্যকলাপ ও আচার আচরণই 'রিফ্লেক্স অ্যাকশন' (পরাবর্ত ক্রিয়া)— অর্থাৎ 'কন্ডিশনড রিফ্লেক্স' (শর্তাধীন পরাবর্ত) এবং 'আনকন্ডিশনড রিফ্লেক্সে'র (শর্তহীন পরাবর্ত) দ্বারা পরিচালিত। তার দ্বারাই তারা সব কিছু করে। তাদের 'ইনটেলিজেন্স' (বুদ্ধিশুদ্ধি) সম্পর্কে যাই বলা হোক, তা কন্ডিশনড রিফ্লেক্সেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ছাড়া কিছু নয়। মানুষের মধ্যে সেখান থেকে আরেকটা প্রক্রিয়া ফলো করে। মানুষের মস্তিষ্কের গঠনের মধ্যে সেই ক্ষমতা আছে— যেটা 'সেনসেশন টু মোটর অ্যাকশন'-এ (সংবেদন থেকে পেশী সঞ্চালন) এসে 'রিফ্লেক্স অ্যাকশনে'ই শেষ হয়ে যাচ্ছে না— আর একটা 'সিগন্যাল' (সংকেত) দ্বারা, দ্বিতীয় সিগন্যাল সিসটেম দ্বারা একটা নতুন 'ট্র্যাক' সৃষ্টি হচ্ছে— সেই ট্র্যাকটি 'লিডিং টু পারসেপশন, কনসেপসন অ্যান্ড দেন টু ইমোশন' (গতিপথটি ভাব, উন্নততর ভাব ও তারপর আবেগের সৃষ্টি করে)। জন্তু-জানোয়ারের যেখানে শুধু 'ফিজিক্যাল ব্লাইন্ড ইমোশন' (অন্ধ শারীরিক ক্রিয়া)— অর্থাৎ 'ইমোশনাল নার্ভাস অ্যাকটিভিটি ইজ দি ওনলি পসিবল অ্যাকটিভিটি' (অন্ধ স্নায়ু ক্রিয়াই একমাত্র সম্ভাব্য ক্রিয়া), সেখানে মানুষের ক্ষেত্রে এই অ্যাকটিভিটি আরও উচ্চস্তরে কাজ করে। মানুষের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি হচ্ছে, 'ফ্রম ব্লাইন্ড ইমোশন টু রিজনিং থ্রু প্রসেস অব ট্রান্সলেশন' (চিন্তাভাবনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে অন্ধ স্নায়ুক্রিয়া থেকে যুক্তিতে পৌঁছানো)— সেখান থেকে 'পারসেপচুয়াল নলেজ', তার থেকে 'কনসেপচুয়াল নলেজ' এবং শেষপর্যন্ত আবার একটা উন্নত ধরনের ইমোশন।

সুতরাং মানুষের মধ্যে আমরা দু'ধরনের ইমোশন দেখতে পাই। একটা হচ্ছে ব্লাইন্ড টাইপ অব ইমোশন— যেটা 'নটটিউনড অর গাইডেড বাই রিজন অর কনসেপচুয়াল নলেজ' (যুক্তি বা উন্নততর ভাব ও জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত নয়)। এই ব্লাইন্ড ইমোশনও মানুষকে চালায়। এই ব্লাইন্ড ইমোশন হচ্ছে অন্ধের মতন। এখানে মানুষের আচরণ খানিকটা জানোয়ারের মতোই, অবস্থার ওপর নির্ভরশীল, পরিবেশের দাস। এই ইমোশনাল মুভমেন্টটা মানুষকে হঠাৎ বড়ও করে দিতে পারে, মানুষকে একদম নিচেও নামিয়ে দিতে পারে। সুতরাং এই ইমোশন অন্ধ। এর ওপর নির্ভর করা চলে না। এই ব্লাইন্ড ইমোশন থেকে ট্রানশ্লেসন-এর মধ্যে দিয়ে মানুষের মধ্যে যে পারসেপচুয়াল নলেজ গড়ে ওঠে সেও ভাসাভাসা জ্ঞান। তার দ্বারাও মানুষ এই 'ইমোশনাল কারভেচার'টিকে (অন্ধ স্নায়ুক্রিয়ার বিশেষ গতিকে) পুরোপুরি কনট্রোল করতে পারে না। তার থেকে যে কনসেপচুয়াল নলেজ, অর্থাৎ কংক্রিট নলেজ মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় যেটা 'গাইডেন্স প্রোভাইড' (পথ প্রদর্শনের) করার ক্ষমতা রাখে, সেই কংক্রিট নলেজ-ই ব্লাইন্ড ইমোশনকে 'প্যাটার্ন' করে (একটি আদলে গড়ে তোলে), 'টিউন' করে (একটি বিশেষ সুরে বেঁধে দেয়)। ফলে এর থেকে যে ইমোশন রিলিজড হয় সেটা বেসড অন নলেজ (জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে) — অর্থাৎ চেতনার ওপর, নলেজ-এর ওপর আবার ইমোশন। বিপ্লবীদের যে ইমোশন আমরা দেখতে পাই সেটা এই চেতনার ওপর ইমোশন। তাই একে রাশ টেনে ধরতেও তারা পারে। এই ইমোশন তাদের বিপথগামী করে দেয় না, তাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে না। যে আবেগ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে তা হল সেই প্রথম আবেগ যেটা ব্লাইন্ড ইমোশন। কিন্তু যে আবেগ বেসড অন নলেজ অ্যান্ড রিজন সেটা ব্লাইন্ড ইমোশন-এর থেকেও আরও কার্যকরী, আরও 'ডিসিসিভ'। ...

বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে প্রতিটি মানুষের সমাজচেতনার ক্যাটিগরিটাকে অ্যানালিসিস করলে দেখা যাবে, কারোর মধ্যে এটা পুরোপুরি বুর্জোয়া ভাবনাধারণা, কারোর মধ্যে প্রধানত শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী ভাবনাধারণা, আবার কারোর মধ্যে বুর্জোয়া এবং শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী ভাবনাধারণার একটা আধাখিচুড়ি হয়ে আছে— অর্থাৎ কিছুটা বুর্জোয়া ভাবনাধারণার প্রভাব, কিছুটা শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী ভাবনাধারণার প্রভাব— এই দিয়ে তার বিবেকটির গঠন। যার মধ্যে এইভাবে কিছুটা বুর্জোয়া ভাবনাধারণার প্রভাব, কিছুটা শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী ভাবনাধারণা মিশে আছে, দেখা যায়, কখনও তার বিবেক বলে বুর্জোয়ার পক্ষ নিতে, কখনও তার বিবেক বলে শ্রমিক আন্দোলন সমর্থন করতে। কিন্তু সবসময়ই প্রত্যেকের বিবেক তার ব্যক্তিস্বার্থ বা ইগোকে খারাপ কিছু না করতে নির্দেশ করছে। এইভাবে ইগো এবং সুপার ইগোর দ্বন্দ্ব প্রতিটি মানুষের মধ্যে সবসময়ই হচ্ছে এবং এটা চলতেই থাকবে। যতক্ষণ না উৎপাদনকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে সংঘর্ষ সেই সংঘর্ষের বীজ সমাজজীবন থেকে সম্পূর্ণভাবে চলে যাচ্ছে ততক্ষণ 'ইনডিভিজুয়াল সাইকোলজি'র, অর্থাৎ ইনডিভিজুয়ালিটি বা ব্যক্তিসত্তার এই 'ফেনোমেনন' 'এলিমিনেটেড' হবে না। আজকের পুঁজিবাদী সমাজে সমস্ত মানুষেরই ইগো গড়ে উঠছে কমবেশি বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রাধান্যে অথবা শ্রমিক ভাবাদর্শের প্রাধান্যে। ফিউডাল ভাবধারা যদি তার মধ্যে মিশ্রিত থেকেও থাকে তবুও তার মধ্যে বুর্জোয়া ভাবধারা প্রধান, কি শ্রমিক শ্রেণির ভাবধারা প্রধান তা দিয়ে তার চরিত্র নির্ধারণ করতে হবে অর্থাৎ 'ডমিনেন্ট' (প্রধান) চরিত্র দিয়েই তা নির্ধারিত করতে হবে। পুরোপুরি সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারায় আজ আর কারোরই চলার উপায় নেই।

সুতরাং সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ, ব্যক্তিবাদী প্রবণতা, অহম ইত্যাদির ঊর্ধ্বে ওঠার জন্য একজন ব্যক্তির যে সংগ্রাম তা যদি বৃহত্তর সামাজিক সংগ্রামের সঙ্গে, শ্রমিক শ্রেণির মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত না হয় তাহলে উদ্দেশ্য যতই সৎ হোক না কেন তার পক্ষে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাই ব্যক্তির সংগ্রামকে সবসময় সমষ্টির সংগ্রামের সাথে মেলাতে হবে। কিন্তু এই সমষ্টিগত সংগ্রামকেও সঠিক পথে পরিচালনার জন্য এবং ভুলত্রুটি থেকে তাকে মুক্ত রাখার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে তা চালানো প্রয়োজন। তাই জনসাধারণের মধ্যে পড়ে থেকে দলের রুটিন ওয়ার্ক চালানোর মধ্যে কর্মীদের যে একটা ঢিলেঢালা গতানুগতিক মনোভাব আছে তাকে দূর করে কাজের গতিকে যেমন আপনাদের বাড়াতে হবে, তেমনি সাথে সাথে তা সুপরিকল্পিতভাবে করতে হবে। যদি দেখা যায়, কাজের গতি দ্রুত হচ্ছে কিন্তু তা পরিকল্পিতভাবে হচ্ছে না তাহলে তাতে হবে না। হয়তো ছোটাছুটি করে আপনারা একটা কিছু করে ফেললেন, কিন্তু দেখা গেল সেই করার পেছনে কোনও পরিকল্পনা নেই, আদর্শগত ভিত্তি নেই, তা সমষ্টিগত পরিকল্পনায় করা হয়নি তাহলে তা দাঁড়াবে না। তাতে অযথা সময়ের অপব্যবহার হবে। কাজেই আমার বক্তব্য এটা নয় যে, কাজের ক্ষেত্রে আপনারা লাফিয়ে লাফিয়ে কতটা এগিয়ে যেতে পারলেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে, আপনারা হেঁটেই যাবেন বা সামর্থ্য অনুযায়ী দৌড়েই যাবেন, কিন্তু যাবেন পরিকল্পনার ভিত্তিতে, সুষ্ঠু নেতৃত্বের অধীনে। ব্যক্তিগত আচরণ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার যে ঝোঁক প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে তাকে সমাজচেতনার দ্বারা প্যাটার্ন করে, টিউন করে আপনাদের চলতে হবে।

এইভাবে পরিকল্পনার ভিত্তিতে সুষ্ঠু নেতৃত্বের অধীনে পার্টির কর্মসূচিগুলি যদি আপনারা রূপায়িত করতে থাকেন এবং সাথে সাথে পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে কোথায় কী ত্রুটি আছে সমষ্টিগতভাবে আলোচনা করে কীভাবে তাকে আরও সুন্দর করা যায় সেই চেষ্টা করতে থাকেন তাহলে দ্রুত সংগঠনকে প্রয়োজন অনুযায়ী শক্ত ভিতের ওপরে দাঁড় করাতে আপনারা সক্ষম হবেন।...

যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি ও পার্টির সাংগঠনিক কাজকর্মের কয়েকটি দিক
নির্বাচিত রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড

ধর্ষণে অভিযুক্ত বিজেপি বিধায়ক, শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ

জৌনপুর, উত্তরপ্রদেশ

বাঙ্গালোর, কর্ণাটক

রাজভবন, কলকাতা

গুজরাট

গুনা, মধ্যপ্রদেশ

দেশকে কোথায় নিয়ে চলেছে বিজেপি!

একের পাতার পর

পর আপনি বলেছেন, আপনি বেটিদের বাঁচাবেন! অথচ আপনার দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংহ জম্মুতে গিয়ে হিন্দু একতা মঞ্চের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করে তাদের অভয় দিয়ে এসেছেন।

উত্তরপ্রদেশের উন্নাওতে বিজেপি বিধায়ককে ভাইয়া বলে ডেকেছিল যে মেয়ে তাকে দীর্ঘদিন ধরে আটকে রেখে ধর্ষণ করল বিজেপির সেই বিধায়ক কুলদীপ সিংহ সেঙ্গার এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গরা। বিষয়টি জানাজানি হয়ে যেতে নির্যাতিতা তরুণীর পরিবারকে চাপ দেওয়া হল অভিযোগ তুলে নিতে। উত্তরপ্রদেশের পুলিশ প্রধান বলে দিলেন, বিধায়ক সম্মানীয় ব্যক্তি, তাঁর সম্মান রক্ষা করতে হবে, এফআইআরেও নাম রাখল না পুলিশ। নির্যাতিতার বাবাকে বিধায়কের ভাইয়ের নির্দেশে তুলে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে খুন করা হল পুলিশের হেফাজতেই। হাইকোর্ট আদেশ দেওয়ার আগে পর্যন্ত নির্বিকার থাকল, তদন্তটুকুও শুরু করল না রামরাজ্যের কর্ণধার যোগী আদিত্যনাথের পুলিশ! সারা দেশে বিক্ষোভ শুরু হতে বিজেপি বিধায়ককে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছে পুলিশ। তারপরেও জেলবন্দি বিধায়ক এবং তার ভাইয়ের তরফ থেকে চরম পরিণতির হুমকি পাচ্ছে নির্যাতিতার পরিবার।

এর মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের ভাইব্র্যান্ট গুজরাটের সুরাতে এক কিশোরীর ওপর যে ধরনের নির্যাতন চলেছে, তাকে পাশবিক বললে পশুকেও অপমান করা হয়। এমন ঘটনা শুধু ঘটাতে পারে মনুষ্যত্বহীন মানবদেহধারী কিছু পশুই। একটা ঘটনা শেষ হতে না হতেই হরিয়ানার রোহতক, দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গে পর্যন্ত অসংখ্য নারী নির্যাতন-ধর্ষণ-খুনের ঘটনা যেন স্রোতের মতো সামনে আসছে। কিন্তু কোন পরিস্থিতি বিরাজ করলে ধারাবাহিকভাবে এমন পশুদের সৃষ্টি করে সমাজ? দেশের ৪৯ জন প্রাক্তন আমলা প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে বলেছেন, 'আট বছরের মেয়ের ধর্ষণ ও খুনের হিংস্রতা ও বর্বরতা বুঝিয়ে দিচ্ছে আমরা কতটা নিচে নেমেছি। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে এটাই সবচেয়ে অন্ধকার অধ্যায়। ... এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে অন্ধকার সুড়ঙ্গের শেষে আমরা কোথাও আলো দেখছি না। লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে যাচ্ছে।' তাঁরা আরও লিখেছেন, 'উত্তরপ্রদেশের উন্নাও। সেখানে পিতৃতন্ত্র আর সামন্ততন্ত্রের নিকৃষ্টতম ঘরানার মাফিয়া ডনদের উপরেই ভোট আর ক্ষমতা দখলের জন্য নির্ভর করা হয়। ধর্ষণ-খুন আর তোলাবাজির স্বাধীনতাকেই এই মাফিয়ারা নিজস্ব ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রকৃষ্ট উপায় বলে মনে করে।'

এই বিকৃতি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী রাষ্ট্রে আছেই। কিন্তু তা আরও ভয়াবহ জায়গায় পৌঁছচ্ছে আরএসএস-বিজেপির মধ্যযুগীয় ধর্মীয় কূপমণ্ডুক দৃষ্টিভঙ্গিতে পুরুষতন্ত্রের চোখ দিয়ে মেয়েদের কেবল ভোগের বস্তু হিসাবে দেখার মানসিকতা সমাজকে ছেয়ে ফেলছে বলে। আরএসএসের হিন্দুত্ববাদী দর্শনের মূল কথার মধ্যেই আছে মেয়েদের জন্মই পুরুষের সেবার কাজে। পুরুষ যদি মেয়েদের উপর কিছু অন্যায়ও করে তার জন্য দায়ী মেয়েরাই। কিছুদিন আগে দিল্লির নির্ভয়া ঘটনার সময় আরএসএস-বিজেপির একের পর এক নেতা এমন সব কথাই বলেছিলেন। হরিয়ানায় এক তরুণীর গাড়ি ধাওয়া করে বিজেপি নেতার ছেলে মেয়েটির শ্লীলতাহানি করলে এক মন্ত্রী বলেছিলেন, 'এই সব একটু আধটু ভুলের জন্য ছেলেদের ক্ষমা করে দিতে হয়।' অন্যান্য বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের মানসিকতাতেও এই ধরনের চিন্তা গেড়ে বসে আছে। তাই এই কদর্য মানসিকতার প্রসার ঘটতে পারছে সহজেই। একইসাথে, যে ভাবে হোক ক্ষমতায় যাওয়ার উদগ্র লোভ চরিতার্থ করতে এইসব লম্পটদের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে যুব সমাজকে মদ-মাদকের নেশা, বিকৃত যৌনতার ঘূর্ণিতে ফেলে সম্পূর্ণ দিশাহারা করে দিয়ে তাদের যথেচ্ছ ব্যবহার করছে বিজেপি-কংগ্রেসের মতো ভোটবাজ বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলি। সমস্ত ধরনের নীতি-নৈতিকতা, পারিবারিক সম্পর্কের মাধুর্য, বন্ধুত্ব, ভালবাসা সহ সমস্ত সুকুমার বৃত্তিকে পুরোপুরি সমাজ থেকে মুছে দেওয়ার কাজে সচেষ্ট পুঁজিপতি শ্রেণি। একাজে তাদের হাতিয়ার ভোটবাজ দলগুলির নীতিবর্জিত রাজনীতি। এর সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপক প্রসার সমাজে টিকে থাকা ছিটেফোঁটা মনুষ্যত্বকেও ধুয়ে মুছে সাফ করে দিচ্ছে।

এই গভীর অন্ধকারের মধ্যেও আশার আলো দেখিয়েছে দেশ জোড়া স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ প্রতিবাদে নেমেছেন। একদিন হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার মধ্যে মন্দির-মসজিদের সামনে মৃত শিশুর লাশ কোলে ভিখারিনী মাকে দেখে নজরুলের কলম গর্জে উঠে বলেছিল— এতেও দেবতা টললেন না, মসজিদ থেকে কোনও শক্তি এসে মায়ের চোখের জল মোছালো না। তিনি মানবতাকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন, 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।' জম্মুর শিশু আসিফার উপর মন্দিরের মধ্যেই অত্যাচার করতে পেরেছে তথাকথিত ধর্মধ্বজীরা, তাকে রক্ষার দায়িত্ব ছিল যে পুলিশ-প্রশাসনের তারাও দায়িত্ব পালন না করে দুষ্কৃতীদের পক্ষ নিল। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, যাদের দায়িত্ব জনস্বার্থ রক্ষা করা, তারা উৎপীড়কের ভূমিকায়। মানুষের সামনে তবে কোন পথটি খোলা থাকল? প্রতিবাদ, জোরালো প্রতিবাদ ছাড়া? এই প্রতিবাদই মনুষ্যত্বের শিখাটিকে জ্বালিয়ে রেখে মানুষকে পথ দেখাতে পারে। এই শিখাকে যে কোনও মূল্যে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। ঘোর অন্ধকারের মাঝে সেটাই আশার আলো।

মছলন্দপুরে কাঠুয়া-উন্নাও কাণ্ডের প্রতিবাদ

১৪ এপ্রিল এমএসএস, ইমন মাইম সেন্টার ও মনীষা সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগণার মছলন্দপুরে শিশু-অভিভাবকদের প্রতিবাদ

কালেক্টরেট কর্মচারীদের বিক্ষোভ

বাঁকুড়া জেলা কালেক্টরেটের কর্মচারীরা পঞ্চায়েতি সন্ত্রাসের প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন। বিরোধীদের নমিনেশনপত্র জমা দেওয়া আটকাতে কালেক্টরেটের প্রতিটি প্রবেশ পথের মুখে দুষ্কৃতীরা যেভাবে পরিচয়পত্র চেকিংয়ের নামে সরকারি কর্মচারীদের বিব্রত করেছে তা সমগ্র প্রশাসনের অমর্যাদা। ১০ এপ্রিল বাঁকুড়া জেলাশাসককে লেখা এক স্মারকপত্রে ১১৩ জন সরকারি কর্মচারী এই ক্ষোভের কথা জানিয়ে দাবি করেছেন কর্মচারীদের নিরাপত্তা এবং কাজের পরিবেশ দিতে হবে।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের যৌথ প্রতিবাদ

১ মে ঐতিহাসিক মে দিবসে পঞ্চায়েত নির্বাচন না করার দাবি জানিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনাররের দপ্তরের সামনে ৩ এপ্রিল তীব্র বিক্ষোভ দেখায় ১৩টি রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠন।

সিপিআই(এম-এল) লিবারেশনের পার্টি কংগ্রেসে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

২৪ মার্চ পাঞ্জাবের মানসায় সিপিআই (এম-এল) লিবারেশন-এর দশম পার্টি কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে আমন্ত্রিত এসইউসিআই (সি) -র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সত্যবান নিম্নের ভাষণটি রাখেন।

সিপিআই (এম-এল) লিবারেশনের দশম পার্টি কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে আজ আমি এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের বিপ্লবী অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাদের এই পার্টি কংগ্রেস এমন একটা সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন এই দেশের এবং গোটা বিশ্বের পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্কটে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি গোটা বিশ্ব জুড়ে একের পর এক ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে। আমেরিকা সহ এইসব সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে ভারতীয় পুঁজিপতিরা অত্যন্ত খোলাখুলি বিপজ্জনকভাবে হাত মিলিয়ে চলছে।

আপনারা জানেন, ভারতীয় পুঁজিপতিরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে একযোগে বিশ্বায়নের নীতি চালু করে বিদ্যমান অর্থনৈতিক সঙ্কট সমাধানের যে কথা ঘোষণা করেছিল, তা ব্যর্থ হয়েছে। চীন ও রাশিয়ার নবগঠিত সাম্রাজ্যবাদী জোটের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আমেরিকা জাপান, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার সাম্রাজ্যবাদী জোটের সঙ্গে ভারত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করছে। দেশের ভিতরেও মেহনতি জনতার শেষ রক্তবিন্দুটুকুও শোষণ করে তাদের প্রাণের বিনিময়ে ভারত রাষ্ট্র নিজের পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে অতি দ্রুত আরও শক্তিশালী করে তুলছে। শুধু যে খেটে-খাওয়া মানুষকে ব্যাপক শোষণ ও নিপীড়ন করা হচ্ছে তাই নয়, তাদের মধ্যেকার ঐক্য ধ্বংস করতে সমাজের নানা সামাজিক ও ধর্মীয় অংশগুলিকে একে অপরের বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়ে শত্রুতা এবং ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও সংঘর্ষ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এ হল এক ফ্যাসিবাদী কৌশল এবং আমাদের অবশ্যই এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

বর্তমানে গোটা বিশ্ব জুড়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আরও বেশি বেশি করে ফ্যাসিবাদের আশ্রয় নিচ্ছে। শুধু নগ্ন সামরিক একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরাচারী শাসনের রূপে নয়, সংসদীয় কাঠামোর মধ্যে একদলীয় বা দ্বিদলীয় শাসনের আড়ালেও ফ্যাসিবাদ আজ প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশের বৈশিষ্ট্য। আপনারা লক্ষ করছেন যে ভারতে মুষ্টিমেয় বহুজাতিক ও একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের হাতে গোটা অর্থনীতি কুক্ষিগত। কেন্দ্রীভূত প্রশাসন সর্বত্রই উচ্চতম আমলাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। বিচারবিভাগকেও নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই আক্রমণ সবচেয়ে মারাত্মক। বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিকৃত করে অন্ধ ভক্তি ও উগ্র জাতিবিদ্বেষের সংস্কৃতি গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে।

প্রায় প্রতিটি দেশেরই একই চিত্র। বহু দিন আগেই মহান লেনিন ও স্ট্যালিন এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক করেছেন। তাঁদের শিক্ষা রয়েছে আমাদের কাছে। আমরা নিজেরা দীর্ঘদিন ধরেই বুঝতে পারছি যে পুঁজিবাদ আজ আর গণতন্ত্র বা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে না। আমলাতন্ত্র ও সামরিকতন্ত্রের উপর তার প্রধানত নির্ভরশীলতা। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ক্রমেই বহুজাতিক ও একচেটিয়া পুঁজির আরও বেশি দাসানুদাস হয়ে পড়ছে। কংগ্রেসের আমল থেকেই এর শুরু। প্রথম থেকে তারা এ বিষয়ে জোর দিয়েছিল। এখন বিজেপি নগ্নভাবে সেই একই পথ ধরেছে। এর প্রতিরোধ করতে হবে আমাদের। নির্বাচনী জোট করে বা নির্বাচনী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে একে প্রতিরোধ করা যাবে না। ধারাবাহিক বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলনের মাধ্যমেই একে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

দেশে নানা স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ আন্দোলন সংঘটিত হয়ে চলেছে। কিন্তু আজ প্রয়োজন সঠিক নেতৃত্বে সুসমন্বিত, সুসংগঠিত আন্দোলন। বামপন্থীরা ছাড়া অন্য কোনও শক্তি এটা গড়ে তুলতে পারে না। এটাই আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। বামপন্থী আন্দোলনের এই ঢেউ গোটা দেশে মানুষের ঐক্য রক্ষা করবে। শ্রমিক, কৃষক, শোষিত-নিপীড়িত মানুষের অধিকার যা বর্তমানে নির্মম আক্রমণের মুখে পড়ছে, বামপন্থী আন্দোলনের তরঙ্গই তাকে রক্ষা করতে পারে। মুক্তির স্বপ্ন, ভগৎ সিং সহ স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর শহিদদের স্বপ্ন বুকে নিয়ে যে দিনটির জন্য আমরা রক্তপতাকা হাতে অপেক্ষা করছি, সেই দিন নিশ্চয়ই আসবে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও আমাদের কত সাথী প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁদের আত্মবলিদানের মর্যাদা রক্ষা করতে এ ছাড়া অন্য পথ নেই। ফলে বাম ঐক্যের লক্ষ্যে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এবং আমাদের বিশ্বাস সিপিআই (এম-এল)-লিবারেশনের এই দশম পার্টি কংগ্রেস সেই লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সিরিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী জোটের হানাদারির প্রতিবাদে বিক্ষোভ, ট্রাম্পের কুশপুতুলে আগুন

গুয়াহাটি, আসাম

হায়দরাবাদ, তেলেঙ্গানা

জাজপুর, ওড়িশা

ভিওয়ানি, হরিয়ানা

ক্ষেপণাস্ত্র হানার নিন্দা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ফোরামের

অল ইন্ডিয়া সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ফোরামের সহ সভাপতি মানিক মুখার্জী সিরিয়ার উপর মার্কিন-ব্রিটিশ-ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীদের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার তীব্র নিন্দা করে ১৫ এপ্রিল বলেন, আন্তর্জাতিক আইন এবং রাষ্ট্রসংঘের অনুমতির তোয়াক্কা না করে এই আগ্রাসন যারা চালিয়েছে তারা যুদ্ধাপরাধী।

তিনি বলেন, এই আক্রমণের জন্য যেভাবে পরিকল্পিত মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে জমি প্রস্তুত করা হয়েছে তা ইরাক ধ্বংসের জন্য মার্কিন অজুহাত সৃষ্টির ঘটনাকে মনে পড়িয়ে দেয়। এই ক্ষেপণাস্ত্র হানা সিরিয়ার মানুষের দুর্দশাকে আরও বাড়াবে শুধু তাই নয় সিরিয়া সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পথকে রুদ্ধ করবে। তিনি সিরিয়াকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য শান্তিকামী গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে আহ্বান জানান।

মৃত্যুর কারণ যখন সরকারি নীতি তখন পোস্টমর্টেম কী প্রয়োজন?

ভাঁজ করা কাগজটা সুইসাইড নোট। তাতে সরাসরি অভিযোগ করা হয়েছে, 'আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি'। দেশের কোনও প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে তাঁর দেশের এক চাষি ইতিপূর্বে এমনভাবে অভিযোগ করেছেন কিনা আমাদের জানা নেই।

ঘটনা মহারাষ্ট্রের ইয়তমল জেলার। রাজুরাওয়াদি গ্রামের চাষি শঙ্কর ভাওরাও ছায়ারে। বছর পঞ্চাশেক বয়স। ১০ এপ্রিল তিনি আত্মহত্যা করেন। প্রথম চেষ্টা ফাঁসিতে। কিন্তু দড়ি ছিঁড়ে পড়ে যাওয়ায় শেষে বিষ খান। সুইসাইড নোটে তিনি লিখেছেন, 'প্রচুর টাকা ঋণ নিয়ে তিনি তুলো চাষ করেছেন। কিন্তু গোলাপী পোকায় তা নষ্ট করে দিয়েছে।

কিন্তু শঙ্কর তো এই অবস্থায় সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি করতে পারতেন। তা করলেন না কেন? কেন তিনি চরম পথ বেছে নিলেন?

এ প্রশ্নের উত্তর আর আত্মঘাতী চাষির কাছে পাওয়া যাবে না। এর উত্তর দিয়েছেন ওই গ্রামের এক চাষি। সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, গত বছর মঙ্গাওকর নামে এক চাষি যখন আত্মহত্যা করেছিল, সরকার বলেছিল চাষি পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেবে। কিন্তু আজও ওই পরিবার ক্ষতিপূরণ পাননি। ক্ষোভের সাথে তিনি বলেন, 'এই সরকার কৃষককে শেষ করে দিচ্ছে। এমন নিষ্ঠুর সরকার আমি কখনও দেখিনি।'

অভিযোগের তীর যে কেন্দ্রে ও রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের দিকে তা বলাই বাহুল্য। শঙ্কর বুঝেছিলেন, সরকারের কাছ থেকে কোনও ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে না। অভিজ্ঞতায় তিনি এও দেখেছিলেন, সরকার কোনও ফসলের ক্ষেত্রেই ন্যায্য দাম পাওয়ার ব্যবস্থা করেনি। তা হলে কীসের ভিত্তিতে তিনি ভবিষ্যতে এই ঋণ শোধ করবেন? এই ঋণ শোধ করার জন্য যে জমিজমা বিক্রি করে দিয়ে সপরিবারে পথে বসতে হবে এটা বুঝেই সম্ভবত তিনি এই চরম পথ বেছে নিয়েছেন।

গ্রামের কৃষকরা শঙ্করের মরদেহ পোস্টমর্টেম করতে দেননি। তাঁদের বক্তব্য মৃত্যুর কারণ যখন জানাই তখন পোস্টমর্টেম কী প্রয়োজন? তাঁরা রুখে দাঁড়িয়ে পুলিশকে মৃতদেহ নিতে দেননি। প্রধানমন্ত্রীকে অভিযুক্ত করে এফ আই আর করেছেন গ্রামবাসীরা। একটা মানুষের বেঁচে থাকা বা মৃত্যু কীভাবে সরকারি নীতি বা পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত, মহারাষ্ট্রের এই চাষির সুইসাইড নোট দেশবাসীকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়ে গেল।

পাঠকের মতামত

উগ্র ধর্মান্ধতার সাথে পাকিস্তান বিরোধিতার মিশেল

সংবাদপত্রে সম্প্রতি লক্ষ করা গেল, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এখন পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও শান্তির সম্পর্ক রক্ষা করবে না। প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের শাসক শ্রেণি কেন শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক চায় না? ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার আগে বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল দৃঢ়তার সঙ্গে, বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গিতে পাকিস্তান সহ অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের সাথে আন্তরাষ্ট্র কূটনৈতিক সম্পর্ক মজবুত করা হবে। বিজেপি সরকারের এই সিদ্ধান্ত কি তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ?

বিজেপির অতীত বলে, কোনও নির্বাচন এলেই তারা যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলার চেষ্টা করে। ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচনের আগে ১৩ মাসের বাজপেয়ী সরকার ১৯৯৯ সালে দু'মাস ধরে কার্গিল যুদ্ধ চালিয়েছিল। বেশ কয়েকশো সেনা ও সাধারণ মানুষের প্রাণহানির বিনিময়ে প্রবল পাকিস্তান বিরোধী আবহে প্রথমবার গরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে সরকার গড়েছিল বিজেপি। কার্গিল যুদ্ধ বাজপেয়ী সরকারের আমলে ৮০ টাকা কেজি পেঁয়াজের ঝাঁঝ ভুলিয়ে দিয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের গত বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে ভারতীয় সেনা পাকিস্তানের ভিতর ঢুকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালিয়েছিল, এমনটা দাবি করে মোদি সরকার জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগ তোলার চেষ্টা চালায়। আবার গুজরাটে গত বিধানসভা নির্বাচনের আগেও ঠিক এমনি করে পাকিস্তান বিরোধিতার সুরকে অনেক উচ্চগ্রামে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তা হলে দেখা যাচ্ছে, নির্বাচন এলেই জাতীয়তাবাদী সুর চড়াতে পাকিস্তান বিরোধিতায় নেমে পড়ে বিজেপি সরকার। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়েই কি তবে পাকিস্তান বিরোধিতায় শান লাগাচ্ছে মোদি সরকার?

পাকিস্তান সহ সমস্ত প্রতিবেশী দেশের শাসকগোষ্ঠীও ভারতবিরোধিতার জিগির তুলে নিজেদের জনস্বার্থবিরোধী শাসন আড়াল করে থাকে। এটা শাসক বুর্জোয়াদলগুলির বৈশিষ্ট্য একটু বিচার করলেই দেখা যাবে দেশের শাসকদের পাকিস্তান বিরোধিতার সঙ্গে দেশপ্রেমের কোনও সম্পর্ক নেই। ভোটব্যাঙ্ক তৈরির লক্ষ্য থেকেই এই জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগের সৃষ্টি। কার্গিল যুদ্ধের সময়ে যখন বহু মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, ঠিক তখনই বাজপেয়ীর জামাই পাকিস্তানের সঙ্গে 'চিনি' বাণিজ্যে যুক্তছিলেন। দুই দেশের পুঁজিপতির মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক তখনও অটুট। এখনও যুদ্ধ যুদ্ধ আবহ সৃষ্টির আড়ালে দু' দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় রাখতে সচেষ্ট মোদি সরকার সে দেশের শাসকের সাথে গোপনে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাস্তবে নোট বাতিল-জিএসটি-এফআরডিআই থেকে উগ্র জাতীয়তাবাদী সন্ত্রাসে গণহত্যা, লাগামছাড়া দুর্নীতি এবং বেকারত্ব-মূল্যবৃদ্ধির ফলে ২০১৪-র মোদি ঝড় দেশ থেকে কার্যত উধাও। মুখ থুবড়ে পড়েছে 'আচ্ছে দিন', 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র গাল ভরা স্লোগান। এ সব থেকে দৃষ্টি ঘোরাতেই মোদি সরকার আগামী লোকসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে একদিকে দেশের মধ্যে উগ্র ধর্মান্ধতা-জাতিবিদ্বেষের সাথে পাকিস্তান বিরোধিতার মিশেল ঘটাচ্ছে। অপরদিকে জনগণের করের টাকায় আমেরিকা-ইজরায়েল-ফ্রান্স-রাশিয়ার মতো সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর থেকে লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ে যুদ্ধ সরঞ্জাম কিনছে, শিক্ষা-স্বাস্থ্যে বরাদ্দ কমিয়ে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়াচ্ছে। এতে প্রতিরক্ষা কতটা বাড়বে, তার চেয়েও বড় প্রশ্ন হল, কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির পরিণামে জনজীবন আরও তছনছ হয়ে যাবে।

আগামী নির্বাচনের মুখে মোদি সরকার পাকিস্তান বিরোধী হাওয়া গরম করার পুরনো খেলায় মেতেছে। এর মধ্যে দেশপ্রেমের ছিঁটেফোঁটাও নেই।

পলাশ মল্লিক, কলকাতা-৬০

বিকল্প ব্যবস্থা না করেই উচ্ছেদ

কোচবিহার জেলায় হলদিবাড়ি মেখলিগঞ্জের মধ্যে যোগাযোগের সুবিধার্থে তিস্তা নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। সেতু নির্মাণের জন্য হলদিবাড়ি বাজার থেকে তিস্তা নদীর ঘাট পর্যন্ত প্রায় নয় কিলোমিটার জুড়ে সড়কের দু'পাশে রয়েছে ছোট ছোট দোকান, বাজার। এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই প্রশাসন তাদের উচ্ছেদ করেছে। জীবিকা হারিয়েছেন ৩০০ পরিবার। এঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সরকারের শুধু মানবিক দায়িত্ব নয়, জনস্বার্থের কথা ভাবলে অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। অথচ রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন।

বুদ্ধদেব রায়, হলদিবাড়ি, কোচবিহার

ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদ নারী নিগ্রহবিরোধী নাগরিক কমিটির

১৪ এপ্রিল পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের বেনাচিতিতে নারী নিগ্রহবিরোধী নাগরিক কমিটির দুর্গাপুর শাখার পক্ষ থেকে মোমবাতি মিছিল করা হয়।

নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটি দেশের নানা প্রান্তে একের পর এক নারী ধর্ষণ ও খুনের মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিবাদে ১৪ এপ্রিল তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। কমিটির পক্ষ থেকে অধ্যাপক পবিত্র গুপ্ত, শতরূপা সান্যাল, রূপশ্রী কাহালি, কুন্তলা ঘোষ দস্তিদার, অনীতা রায়, অধ্যাপক অনিল কুমার ঘোষ, অধ্যাপক শাহনওয়াজ, অধ্যাপক তরুণ দাস, লীনা সেনগুপ্ত প্রমুখের স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে উত্তরপ্রদেশের উন্নাও-এ নাবালিকা গণধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত বিজেপি বিধায়কের কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন। একই সাথে জম্মুর কাঠুয়াতে ৮ বছরের নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় এবং গুজরাটের সুরাটে ১১ বছরের নাবালিকার উপর নৃশংস অত্যাচারের ঘটনায় অভিযুক্তদের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে।

আশাকর্মীদের নিরাপত্তার দাবিতে ডেপুটেশন

আশাকর্মীদের নিরাপত্তা সহ ৪ দফা দাবিতে ৬ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর থানার সামালী ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিএমওএইচ-এর নিকট ডেপুটেশন দেয় পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন। পালস পোলিও কর্মসূচি চলাকালীন ২৬ মার্চ বিষ্ণুপুর থানার চকএনায়েতনগর গ্রামে আশাকর্মী নাসুমা বিবি এক বাড়িতে পোলিও খাওয়াতে গেলে সরকারি সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত জনৈকা গৃহকর্ত্রী সরকারের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে সরকারি প্রতিনিধি হিসাবে আশাকর্মীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মারধর করে ও কানের সোনার দুল জোর করে ছিনিয়ে নেয়। ফলে তাঁর কানের লতি ছিঁড়ে যায়। দুটি সেলাই করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের ব্লক সম্পাদিকা তাপসী মণ্ডলের নেতৃত্বে আশাকর্মীরা এ দিন বিএমওএইচ-এর নিকট স্মারকলিপি দিয়ে তাঁদের নিরাপত্তার দাবি জানান। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের ব্লক সভাপতি কমরেড অজয় ঘোষ, এআইইউ টিইউসি-র জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মনিরুল ইসালম, আশাকর্মী মালা দাস, খাদিজা বেগম, ফরিদা বিবি প্রমুখ।

নির্বাচনের রায় এখন দুষ্কৃতীদের হাতে

একের পাতার পর

ধারা (৪১/৪২/৪৩) অনুযায়ী রাজ্য সরকার ও কমিশনের ক্ষমতা ও উক্ত আইনটি প্রণয়নের সময় অনেকগুলি নির্ণায়ক ক্ষমতা রাজ্য সরকারের হাতে রেখে দিয়েছিল, নিরপেক্ষ কমিশনের হাতে সেসব ক্ষমতা ছাড়েনি। আমরা গণতন্ত্রপ্রিয় নাগরিক সমাজ আশা করব জাতীয় নির্বাচন কমিশনের মডেলে রাজ্যে এমন একটি নির্বাচন কমিশন পরিচালিত হোক, যারা সর্বার্থে স্বাধীন এবং সার্বভৌম— খণ্ডিত অধিকার নিয়ে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যাদের পদে পদে বিড়ম্বিত হতে না হয়। বর্তমান আইনটির ধারা পরিবর্তনের জন্য রাজ্য বিধানসভার সকল সদস্যর কাছে আমাদের এই আবেদনটি বিবেচনার জন্য রইল।

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে দলত্যাগ বা দল পরিবর্তন বিষয়ক যে আইনটি বলবৎ আছে সেটি পরিবর্তনের দাবি জানাচ্ছি আমরা। আজ একটি দলের হয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করার পরমুহূর্তে অন্য একটি দলে চলে যাওয়ার যে অসাধু ও অনৈতিক প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে সেটি রোধ করার জন্য কঠোর নতুন আইনের প্রবর্তন করা চাই। বর্তমানে এ বিষয়ে যে আইন বা প্রয়োগ পদ্ধতি রয়েছে সেটি 'হাস্যকর' প্রমাণিত হয়েছে। নির্বাচকমণ্ডলী এতে প্রতারিত বোধ করছেন। নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করার এ জাতীয় যথেচ্ছাচার অবিলম্বে বাতিল করা প্রয়োজন।

সাম্প্রতিককালে ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে রাজনীতির অনুপ্রবেশ এমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যার ফলে দেশের মানুষ বিপন্ন বোধ করছেন, দেশের সংবিধান এবং তার মৌলিক নীতিরীতি বা নির্দেশ অহরহ লঙ্ঘিত হচ্ছে। শান্তিকামী গণতন্ত্রপ্রিয় যুক্তিবাদী মানুষ আজ অসহায় দর্শকমাত্র— তাঁরা প্রত্যক্ষ করছেন ধর্মক্ষেত্রে, রাজনীতিক্ষেত্রে ভেদনীতির আস্ফালন, শাস্ত্রের নামে অনাচার-অত্যাচার, অস্ত্রশস্ত্রের ঝনঝনানি, মানুষে মানুষে অকারণ হানাহানি, রাজনৈতিক মদতে সুযোগসন্ধানী

পুরুলিয়ার কাশীপুরে টিএমসি দুষ্কৃতীদের আক্রমণে আহত দলের কর্মী কমরেড সোমনাথ কৈবর্ত

দুষ্কৃতীদের অবাধ রাজত্ব। মানবিকতা, মানবাধিকার আজ বিপর্যস্ত। প্রশাসন দ্বিধাগ্রস্ত, দিশেহারা। এই ব্যাধি মহামারীর আকার ধারণ করেছে এবং আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গকেও গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। আমরা সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সমস্ত রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং প্রশাসনের কাছে এই আবেদন রাখব, দেশের গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শকে সবার ওপরে স্থান দিয়ে এই সর্বনাশা ভেদাভেদের রাজনীতির বিরুদ্ধে আমরা যেন ঐক্যবদ্ধভাবে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারি এবং অশুভ শক্তিগুলিকে পরাস্ত করতে পারি।

উচ্চবর্ণবাদী বিজেপির দলিত প্রেমের মুখোশ খুলে গেল

গুজরাতের উনায় দলিত সম্প্রদায়ের চার যুবক, গোরক্ষক বাহিনী যাদের পিটিয়ে হত্যা করেছিল

দেশের বিরাট সংখ্যক দলিত অংশের মানুষদের সম্পর্কে বিজেপির দৃষ্টিভঙ্গিটি ঠিক কী, তা স্পষ্ট হয়ে গেল 'তফসিলি জাতি-উপজাতি নিগ্রহ প্রতিরোধ আইন' দুর্বল করা এবং তার প্রতিবাদে দলিতদের আন্দোলনে গুলি করে ১১ জনকে হত্যার ঘটনায়। সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ, যারা সাধারণভাবে দলিত বলে পরিচিত, কীভাবে যুগ যুগ ধরে উচ্চবর্ণের মানুষদের দ্বারা শোষিত এবং অত্যাচারিত হয়ে আসছে, তা কারও অজানা নয়। এদের বিরুদ্ধে হিংসা রুখতে ১৯৮৯ সালে এই আইন তৈরি হয়েছিল। তারা আক্রান্ত হলে এই আইনে অভিযুক্তকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করার কথা বলা আছে। কিন্তু এক মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ২০ মার্চ সুপ্রিম কোর্ট আদেশ দেয়, অভিযোগ হলেই গ্রেপ্তারি বা ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যাবে না। প্রাথমিক তদন্তে নিশ্চিত হওয়ার পর তবেই দায়ের করা যাবে এফআইআর। সরকারি কর্মীদের বিরুদ্ধে এই ধরনের অত্যাচারের অভিযোগ হলে গ্রেফতারের আগে নিয়োগ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে। আর, কোনও নাগরিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে তাঁকে গ্রেফতারের আগে ডিএসপি পদমর্যাদার কোনও পুলিশ আধিকারিককে দিয়ে তার তদন্ত করাতে হবে। বলা বাহুল্য এর ফলে দলিতদের উপর আক্রমণ আরও বাড়বে।

এমনিতে বিজেপি শাসনে নিম্নবর্ণের মানুষের উপর অত্যাচার বেড়ে চলায় তাঁদের ক্ষোভ বাড়ছিল। সুপ্রিম কোর্টের রায় সেই ক্ষোভের বারুদে আগুন লাগায়। দলিত সংগঠনগুলি ২ এপ্রিল ভারত বনধের ডাক দেয়। বনধ রুখতে রাজ্যে রাজ্যে বিশেষত বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে সরকার ব্যাপক দমন-পীড়ন চালায়। ১১ জন নিহত হন। বহু মানুষকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের নামে যথেচ্ছ মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়।

এই ঘটনা দেখিয়ে দেয় বিজেপির দলিত-প্রীতি কতখানি ভণ্ডামিতে ভরা। জনমতের প্রবল চাপে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তড়িঘড়ি সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন দাখিল করে এবং জানায়, সরকার দলিত আইন লঘু করতে চায় না। অথচ বিক্ষোভের আগে সরকার এই পিটিশনের কথা ভাবেনি। উপরন্তু বিজেপি নেতারা বারবার বলতে থাকেন, সরকার এই মামলার শরিক ছিল না। অর্থাৎ এই রায়ে তাঁদের কোনও দায় নেই। বাস্তবে যে মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের এই আদেশ তাতে কোর্ট এই আইনের অপপ্রয়োগের অভিযোগ সম্পর্কে সরকারের মতামত জানতে চেয়েছিল। সরকার অভিযোগের বিরোধিতা করেনি। উপরন্তু কোর্টকে জানিয়েছিল, কোনও কোনও ক্ষেত্রে আইনের অপব্যবহার হচ্ছে।

বিজেপি সরকার কোথায় এই আইনের অপপ্রয়োগ দেখল? আসলে এই দেখার পিছনে তাদের আরএসএসের ছাঁচে ঢালা উচ্চবর্ণের মানসিকতাটি কাজ করেছে। বাস্তবে বিজেপি সরকারের মন্ত্রীর দেওয়া তথ্যই সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলছে। গত বছর ৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্যসভায় লিখিত প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হংসরাজ গঙ্গারাম আহির যে তথ্য পেশ করেন তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০১৩-তে এই আইনে মামলা হয়েছে ৪৬,১১৪টি, সাজা হয়েছে মাত্রই ৯,৭৭৮ জনের, বিচার বকেয়া ১,১৭,২১৯টি মামলায় (পুরনো ধরে)। '১৪-তে এই সংখ্যাগুলি যথাক্রমে ৪৭,১২৬ ও ১১,৫৬৬ এবং ১,১৯,৪৭৬। '১৫-তে ৪৪,৮৩৯ ও ৯,৮৫৫ এবং ১,১৩,৫১৭। অর্থাৎ মামলা রুজু হলেও তদন্ত বা বিচার চলছে অতি ধীরে বা চলছেই না। অপপ্রয়োগ অনেক দূরের কথা, আইনটির প্রয়োগই হয়নি। আইনটির দুর্বলতার সুযোগই বেশি নিচ্ছে নিগ্রহকারীরা। অথচ দলিতদের উপর নিগ্রহ রোধে আইনটিকে দ্রুত কার্যকর করতে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে বিচার ও কড়া শাস্তির কথা বলা হয়েছিল।

এমনিতেই নিম্নবর্ণের মানুষের উপর উচ্চবর্ণের মানুষের অত্যাচার বরাবরই রয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় বসার পর থেকে গত চার বছরে দেশজুড়ে, বিশেষত বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে এই আক্রমণ ব্যাপক আকার নিয়েছে। ২০০৭-'১৭, দশ বছরে দলিতদের উপর আক্রমণের সংখ্যা ৬৬ শতাংশ বেড়েছে। ন্যাশনাল ক্রাইম বুরোর তথ্য বলছে, গত ১০ বছরে দলিত মহিলাদের ধর্ষণের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রশাসন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনও ব্যবস্থা নেয়নি, না হলে নিতে গড়িমসি করেছে। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হামলাকারীরা বিজেপির সংগঠিত অনুগামী। হিন্দুত্ববাদী সংঘ পরিবারের 'একই সাংস্কৃতিক অভ্যাসের' ফতোয়া এই আক্রমণগুলিকে আরও বাড়িয়েছে। এই হিন্দুত্ববাদীরা নিম্নবর্ণের মানুষের প্রচলিত খাদ্যাভাসকেও গায়ের জোরে বদলে দিতে চাইছে।

একের পর এক এই ধরনের আক্রমণের বিরুদ্ধে যখন সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ দেখা গেছে তখনও প্রধানমন্ত্রী চুপ করে থেকেছেন। তা সে হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক রোহিত ভেমুলার মৃত্যুই হোক কিংবা উনায় মৃত গরুর চামড়া ছাড়ানোর অপরাধে দলিতদের উপর নির্মম অত্যাচারেই হোক। এবারও তফসিলি উপজাতি ও জনজাতি অত্যাচার রোধ আইন সংশোধন নিয়ে দেশের মানুষের এত বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী একবারও বলেননি যে এই আইন সংশোধন তিনি সমর্থন করেন না। বিজেপি যেহেতু পুঁজিপতি শ্রেণির অন্যতম বিশ্বস্ত ভোটবাজ একটি দল, অর্থাৎ তার সমস্ত নীতি-বক্তব্য-প্যাঁচপয়জারের একমাত্র লক্ষ্য ভোটে জেতা, তাই হিন্দুত্বের কথা বলতে গিয়ে বিজেপি নেতারা মাঝে মাঝে, বিশেষত ভোটের আগে, দলিতরাও যে হিন্দু তা জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করেন। কারণ এই বিরাট অংশের মানুষদের ভোটও তাঁদের প্রয়োজন। তাই দলিতপ্রীতি দেখাতে বিজেপি নেতারা এখন আম্বেদকর-ভক্তির বান ডাকাচ্ছেন। বাস্তবে বিজেপি-আরএসএস নেতাদের এই দলিতপ্রেম যে ভোট রাজনীতির স্বার্থেই, তাঁরা যে সত্যিই হিন্দু ধর্মের বর্ণভেদের বিরোধী নন, তা তাঁদের আচরণে প্রতি মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দলিত মানুষের নিরাপত্তা রক্ষার আইনটিকে লঘু করার বিরোধিতা না করাতে তা আরও স্পষ্ট। আরএসএস নেতা মোহন ভাগবত গত চার বছরে বারবার সংবিধানে সংরক্ষণ বাতিল করার দাবি জানিয়েছেন। বিজেপি-আরএসএস নেতাদের মুখে প্রায়ই দলিত বিদ্বেষ প্রকাশ হয়ে পড়ে। কর্ণাটকের বিজেপি নেতা অনন্তকুমার হেগড়ে দলিতদের 'কুকুর' বলে সংবিধান সংশোধনের কথা বলেছিলেন। তিনি দিব্যি কেন্দ্রে মন্ত্রীত্ব করছেন।

এই আদেশের পিছনে সুপ্রিম কোর্টের যুক্তি, আইনের অপপ্রয়োগ আটকাতে এই সংশোধন। আইন বিশেষজ্ঞদের প্রশ্ন, টাডা-পোটা-ইউএপিএ-র অপপ্রয়োগে কত শত নিরপরাধ মানুষকে গ্রেপ্তার করে জেলে ভরা হয়েছে, অথচ এই আইনগুলির অপপ্রয়োগ নিয়ে এমনই সোচ্চার হতে কোর্টকে দেখা যায় না। দেশের থানাগুলিতে প্রতিদিন অজস্র ঘটনায় পুলিশ রামের অপরাধে শত-সহস্র শ্যামকে গ্রেপ্তার করে জেলে ঢোকাচ্ছে, সে ক্ষেত্রেও তো অপপ্রয়োগের অভিযোগ তোলা হয় না। কেন এ সব ক্ষেত্রেও তা হলে প্রাথমিক ভাবে অভিযোগ খতিয়ে দেখে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে তবে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা হবে না? এই আইনের সংশোধনের পিছনে উচ্চবর্ণের মানসিকতা কি প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করছে না?

স্বাধীনতার সাত দশক পরেও ভারতের সমাজ জুড়ে ধর্ম-বর্ণের বৈষম্য ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে রয়েছে। বর্ণবৈষম্য নিরসনে ভীমরাও আম্বেদকর স্বাধীনতার আগে থেকেই চেষ্টা করেছেন। বাস্তবে ছোটখাটো কিছু দাবি আদায় হলেও সমাজের গভীরে বাসা বাঁধা বর্ণবৈষম্যের গায়ে তিনি আঁচড় কাটতে পারেননি। সেই সময়ের কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে একটি বড় অংশ ছিলেন হিন্দুধর্মের কুসংস্কার সহ সমস্ত আচার-বিচার মেনে চলা লোক। তাঁরা জাতীয়তাবাদী হলেও তা ছিল হিন্দু ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ। তাঁদের অনেকের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্মীয় জাত্যভিমান ছিল অত্যন্ত প্রবল। এই জাত্যভিমানীদের একটি অংশই পরবর্তীকালে গড়ে তোলে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। এ দেশের মুসলিম, শিখ, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সহ অন্য ধর্মে বা মতে বিশ্বাসী মানুষদের অধিকার সম্পর্কে এঁদের বিশেষ কোনও ভাবনা ছিল না। হিন্দুধর্মের অন্তর্গত দলিতদের অধিকার সম্পর্কেও তাঁরা চরম উদাসীন ছিলেন। তেমনই আম্বেদকরের দলিত স্বার্থরক্ষার আন্দোলনের মধ্যেও সমাজের গণতন্ত্রীকরণের আন্দোলনটি অনুপস্থিত থেকে গেছে। আম্বেদকর যখন বুঝেছেন, হিন্দুত্ববাদী নেতৃত্ব বর্ণবৈষম্য দূর করতে আগ্রহী নয়, তিনি হতাশ হয়েছেন। হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছেন। জাতপাত-বর্ণবৈষম্য সম্পূর্ণরূপে দূর করতে হলে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে রাজনৈতিক বিপ্লবের কর্মসূচির মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচিকে অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি কাজ ছিল এবং গোটা আন্দোলনের নেতৃত্ব সংস্কারবাদী জাতীয় বুর্জোয়াদের হাতে থাকার দরুন যে এ কাজ সম্ভব হয়নি এটিই তিনি ধরতে পারেননি। সেই সময় দেশে সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি থাকলে তারা এই কাজটি করতে পারত। কিন্তু সে সময় যারা এ দেশে কমিউনিস্ট বলে পরিচিত ছিলেন তাঁরা সমস্যাটা ধরতেই পারেননি।

আজ যাঁরা দলিত স্বার্থরক্ষার নামে নানা সংগঠন গড়ে তুলেছেন এবং নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁরা যদি সত্যিই দলিত স্বার্থ দেখতে চান, তাহলে তাঁদের বুঝতে হবে, সামন্তী সমাজের জাতপাত-সম্প্রদায়ের সমস্যা এটা নয়, এর সাথে যুক্ত হয়েছে পুঁজিবাদী রাজনীতির হিসেব-নিকেশের জটিলতা। এই জটিলতা শুধুমাত্র কিছু আইনি অধিকার দিয়ে দূর করা যাবে না। দলিত সরকার, দলিত রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হবে না। ভীমরাও আম্বেদকর চেয়েছিলেন আইনি রক্ষাকবচ দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দলিতদের আর্থিক উন্নতি ঘটিয়ে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু সেই নির্দিষ্ট সময় বহুদিন আগেই পেরিয়ে গেলেও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বিভেদ দূর হয়নি। কারণ সমানাধিকারের প্রশ্নটি শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটিকে উচ্ছেদের সাথে যুক্ত। এই সমাজ ব্যবস্থাটিকে টিকিয়ে রেখে কিছু ক্ষেত্রে সংরক্ষণ চালু করে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। দলিত সহ সকল সাধারণ মানুষকেও পরিষ্কারভাবে এ কথা বুঝতে হবে, আজ এই সমানাধিকারের প্রশ্নটি আলাদা করে শুধু শোষিত-বঞ্চিত দলিত তথা নিম্নবর্ণের মানুষের সমস্যা নয়, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র শোষিত মানুষের সমস্যা। এর সমাধানটিও যুক্ত হয়ে আছে শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটি উচ্ছেদের সাথে। অতীতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মতোই এ দেশের পুঁজিবাদ আজ তার আয়ুকে দীর্ঘায়িত করতে শোষিত মানুষের মধ্যে অনৈক্য চাইছে, জাতপাত-ধর্ম-বর্ণ নিয়ে ক্রমাগত বিভেদ তৈরি করে চলেছে। পুঁজিবাদের এই চরিত্রকে বুঝে আজ দলিত-মুক্তি আন্দোলনকে সামগ্রিক ভাবে গোটা সমাজের শোষণমুক্তির আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে না পারলে সত্যিকারের দলিত-মুক্তি আসবে না। কাঁসিরাম, মায়াবতী, লালুপ্রসাদ, মুলায়মের মতো এক একজন দলিত নেতা উঠে আসবেন, নেতা হবেন, মন্ত্রী হবেন, প্রচুর সম্পদের মালিক হবেন, আর অন্য বুর্জোয়া নেতারা যা করেন, সেই মিথ্যা স্তোক দিয়ে দলিত সমর্থকদের প্রতারিত করবেন। এমনকী ব্রাহ্মণ্যবাদী দল বিজেপিও আজ শুধুমাত্র ভোট-রাজনীতির ফায়দা তুলতে দলিতদের মন পেতে আম্বেদকরের বড় পূজারি সেজেছে। দলিত-সমস্যা আজও টিকে থাকার জন্য মূলত দায়ী যে কংগ্রেস, তারাও আজ দলিত-দরদি সেজে তাদের ভোটলুঠের খেলায় নেমেছে। এদের সবার আম্বেদকর-পূজার সাথে দলিতদের স্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই। বরং তা দলিতদের প্রকৃত স্বার্থের সাথে এক বিরাট প্রতারণা। তাই আজ দলিত সমাজের শোষণ-মুক্তির সংগ্রামটি এই নিকৃষ্ট পুঁজিবাদী রাজনীতির চরিত্র বুঝে পুঁজিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার এবং তার পরিপূরক সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার সাথে যুক্ত। একমাত্র দ্বারাই সম্ভব সত্যিকারের জাতপাত-ধর্ম-বর্ণ-অস্পৃশ্যতামুক্ত সমাজ গঠন। যতদিন তা না হচ্ছে তত দিন তফসিলি জাতি-উপজাতি নিগ্রহ প্রতিরোধ আইনটিকে পূর্বাবস্থাতেই রাখতে হবে। এজন্য সরকারকে অবিলম্বে অর্ডিন্যান্স জারি করতে হবে।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18

বিজ্ঞানের জন্য পদযাত্রা

বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে ১৪ এপ্রিল সারা পৃথিবী জুড়ে বিজ্ঞানীদের ডাকে অনুষ্ঠিত হল 'মার্চ ফর সায়েন্স'। ভারতবর্ষের দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু সহ ৪০টিরও বেশি শহরের সাথে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে পা মেলালেন প্রায় চার হাজার বিজ্ঞানী-অধ্যাপক-শিক্ষক-গবেষক-

দিল্লি

কলকাতা

বিজ্ঞানপ্রেমী মানুষ। ওই দিন বেলা ৩ টায় প্রবল দাবদাহ উপেক্ষা করে আইএসআই, আইআইএসই আর (কলকাতা), সাহা ইন্সটিটিউট, বোস ইন্সটিটিউট, কালটিভেশন অফ সায়েন্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ শহরের ও আশেপাশের বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান থেকে মৌলালির রামলীলা পার্কে সমবেত হয়ে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত সুসজ্জিত পদযাত্রায় সামিল হয়েছিলেন তাঁরা। 'জিডিপির ১০ শতাংশ শিক্ষাখাতে, ৩ শতাংশ মৌলিক গবেষণায় দিতে হবে', 'অবৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা প্রসার ও ইতিহাস বিকৃতির বিপজ্জনক প্রবণতা বন্ধ কর', 'বিজ্ঞানের সাথে ধর্মীয় চিন্তা মেশানো চলবে না'— এমন নানা দাবি লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে পা মেলানো অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। পতাকা নাড়িয়ে কর্মসূচি সূচনা করেন খ্যাতনামা কণা পদার্থ বিজ্ঞানী অধ্যাপক নবকুমার মণ্ডল।

প্রসঙ্গত, পৃথিবীজুড়ে বিপন্ন পরিবেশ-মানব সভ্যতা। দেশে দেশে আক্রান্ত বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। ভারতবর্ষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে একই প্রতিচ্ছবি। অন্ধতা, গোঁড়ামি, কূপমণ্ডুকতার ব্যাপক প্রচার চলছে। সামাজিক-অর্থনৈতিক নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার বহু স্বাধীন চিন্তাবিদগণও ক্রমাগত আক্রমণের শিকার। উচ্চশিক্ষায়, মৌলিক গবেষণায় সরকারি অর্থবরাদ্দ ক্রমশ কমছে। বিভিন্ন প্রভাবশালী রাজনৈতিকমহল থেকে অবৈজ্ঞানিক চিন্তা প্রসার চলছে ধারাবাহিকভাবে। বিশ্বব্যাপী এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সারা বিশ্বের বিজ্ঞানী মহল বিজ্ঞানের মহান বার্তাকে উর্দ্ধে তুলে ধরতে এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার উপর আক্রমণকে প্রতিহত করতে ১৪ এপ্রিল ২০১৮ 'মার্চ ফর সায়েন্স'-এর ডাক দিয়েছিলেন।

পদযাত্রার উদ্যোক্তা 'মার্চ ফর সায়েন্স কলকাতা অরগানাইজিং কমিটি'র আহ্বায়ক অধ্যাপক নীলেশ মাইতি বলেন, কলকাতা সহ সারা দেশ জুড়ে প্রায় ১৫০০০ মানুষ একই দাবিতে এই আন্তর্জাতিক প্রতিবাদী কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। কমিটির চেয়ারম্যান আধ্যাপক অমিতাভ দত্তের অভিমত, বিজ্ঞানের উপর এই আক্রমণ সভ্যতার সংকট ডেকে আনবে। শৈশব থেকে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি গড়ে তুলতে শিক্ষাক্ষেত্রে সঠিক নীতি চাই। তা বহুক্ষেত্রে লঙ্ঘিত হচ্ছে। তাই এই 'মার্চ'এর দাবি শুধু বিজ্ঞানের জন্য নয়, সভ্যতাকে বাঁচাতেও। উপস্থিত ছিলেন আইআইএসই আর-এর বিজ্ঞানী অধ্যাপক সৌমিত্র ব্যানার্জী, সাহা ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক পলাশবরণ পাল প্রমুখ। মিছিলের শেষে তাঁরা রাজ্যপালকে স্মারকলিপি দেন।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে এসইউসিআই (সি) প্রার্থীদের সমর্থনে দেওয়াল লিখন

মথুরাপুর, জয়নগর (নিচে)

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রাক্ শতবার্ষিকী উদযাপন

পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কুখ্যাত কালা কানুন রাউলাট অ্যাক্টের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা বাগে ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সভায় ব্রিটিশ সরকার বেপরোয়া গুলি চালিয়ে সহস্রাধিক নিরস্ত্র ভারতবাসীকে হত্যা করে। এই বর্বরতার প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়ে সারা দেশ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাইট উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন।

ঐতিহাসিক এই ঘটনার শতবার্ষিকীর শুরুতে গত ১৩ এপ্রিল সেই ঘটনাস্থলেই এমএসএস, ডিওয়াইও, ডিএসও-র যৌথ উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ডিওয়াইও-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রতিভা নায়ক। এসইউসিআই(সি) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সত্যবান এবং এআইডিএসও-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড অশোক মিশ্র যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও মুখ্য বক্তা হিসাবে ভাষণ দেন। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন এমএসএসের দিল্লি রাজ্য সম্পাদক কমরেড রিতু কৌশিক, ডিওয়াইও-র রাজস্থান রাজ্য কনভেনর কমরেড কুলদীপ সিংহ, ডিএসও-র পাঞ্জাব রাজ্য ইনচার্জ কমরেড শিবাশিস প্রহরাজ এবং ডিওয়াইও-র পাঞ্জাব-চণ্ডীগড় ইউনিটের কনভেনর কমরেড বীণা সিং চৌধুরী।

কাঠুয়া ও উন্নাও-এর নৃশংস ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাকে ধিক্কার জানিয়ে সভা থেকে প্রস্তাব গৃহীত হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগ গণহত্যাকাণ্ডের শতবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ষব্যাপী কর্মসূচি ঘোষিত হয়।

আসামে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার সংকোচন করেছে বিজেপি সরকার

আসামেও পঞ্চায়েত নির্বাচন আসন্ন। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস যেমন বিরোধীদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেই দিচ্ছে না, সন্ত্রাস কায়েম করে বেশিরভাগ জায়গায় নমিনেশন পেপার তুলতেই দেয়নি, তুললেও জমা করতে দেয়নি, অথবা জমা দিলেও প্রাণনাশ সহ নানা হুমকি দিয়ে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারে বাধ্য করেছে— যার মূল কথা প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়ানো— আসামে বিজেপিও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়াতে অথবা বহু মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার হরণ করতে নয়া কৌশল নিয়েছে। নির্বাচন কমিশন সম্প্রতি বলেছে, পঞ্চায়েতে গ্রুপ মেম্বারদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক এবং জেলা পরিষদ সদস্যের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক পাশ যোগ্যতা থাকতে হবে। প্রার্থীর বাড়িতে পাকা শৌচালয় থাকতে হবে। এ ছাড়া সন্তান-সন্ততি দুইয়ের বেশি হলে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।

এস ইউ সি আই (সি) কাছাড় জেলা কমিটি এই ফরমান বাতিলের দাবিতে ৯ এপ্রিল জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড শ্যামদেও কুর্মী এবং কমিটির সদস্য কমরেড সুব্রত নাথ। তাঁদের দাবি, শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক সবাইকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার দিতে হবে। তাঁরা বলেন, পার্লামেন্ট সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। তার সদস্য নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার কোনও উল্লেখ নেই। তা হলে পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে তা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে কী উদ্দেশ্যে? পাকা শৌচালয় গ্রামের অধিকাংশ মানুষের নেই। বিজেপির স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মতো একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি এই নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে কেন?

যাদের বাড়িতে শৌচালয় নেই, সরকার দ্রুত তা করে দিক। তা না করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার হরণ করা হচ্ছে কেন? দুইয়ের অধিক সন্তান থাকলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যাবে না—এমন অগণতান্ত্রিক শর্ত চাপানোও রাজনৈতিক দূরভিসন্ধিপ্রসূত। যার মূল কথা হল, একটা বিশাল অংশের মানুষকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না দেওয়া। বক্তারা বলেন, বিজেপি সরকারের ইন্ধন ছাড়া নির্বাচন কমিশন এ কাজ করতে পারে না। অবিলম্বে এইসব শর্ত বাতিল করার জন্য উদ্যোগী হতে জেলাশাসকের মাধ্যমে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পাঠানো হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমরেডস শ্যামদেও কুর্মী, সুব্রত নাথ, প্রদীপ কুমার দেব, অজয় রায় এবং রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড ভবতোষ চক্রবর্তী।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com